# প্রশাসন দলদাসত্বের ট্র্যাডিশনেই

*একের পাতার পর*

জেলায় জেলায় আজ শোনা যায় দুষ্কৃতী-শাসকদলের নেতাদের চক্র এবং তাদের সাথে পুলিশের বেশকিছু কর্তার মাখামাখির কথা। এ সত্য আরও স্পষ্ট হয়েছে বগটুইতে। পুলিশ সেখানে যে ধরনের গা-ছাড়া ভাব দেখিয়ে ঘটনা ঘটতে দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে তা কি বিশেষ স্তরের কোনও নির্দেশ ছাড়া সম্ভব? হাইকোর্টের নির্দেশে সিবিআই তদন্ত চললেও অতীত অভিজ্ঞতা বলছে সে তদন্তেরও রোগের গভীরে ঢোকার সম্ভাবনা কম।

সরকার এবং পুলিশ-প্রশাসনের কর্তারা চাইলে কি পরিস্থিতির এতটা অবনতি রোখা যেত না?? অবশ্যই যেত। কিন্তু তার জন্য সরকারি দলের নেতাদের যে সদিচ্ছা এবং প্রশাসনের কর্তাদের যে মেরুদণ্ডের জোর দরকার তা কি আদৌ আছে? সরকারি দলের বড় নেতারা নিজের প্রভাবাধীন দুষ্কৃতী বাহিনী এবং স্থানীয় ক্ষমতার রাশ কার হাতে থাকবে এই নিয়ে ব্যস্ত। ২০২০-র ৩ এবং ৪ জুলাই দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কুলতলিতে যে দুষ্কৃতী বাহিনী বিধায়কের নেতৃত্বে এসইউসিআই (সি) নেতা কর্মীদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে কমরেড সুধাংশু জানাকে খুন করে তাণ্ডব চালিয়েছিল তারা নাকি 'যুব তৃণমূল', এই 'যুব' বাহিনীকেই দেখা যায় একের পর এক নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কিংবা একেবারে রেকর্ড ভোটে দলের প্রার্থীদের জেতানোর জন্য ছাপ্পা ভোট থেকে শুরু করে গায়ের জোর ফলানোর সব কাজে নামতে। বাহিনী পুষতে গেলে তাদের খুশিও রাখতে হয়, তাই বেআইনি বালি, পাথর, কয়লা, গরু পাচার, মদ ব্যবসা, নারী পাচার চক্র ইত্যাদির রমরমা। সেই সব কারবারে কখনও নেতারা সরাসরি জড়াচ্ছেন, কখনও চোখ বুজে থেকে করতে দিচ্ছেন। আর প্রশাসনের কর্তারা! বখরার সরাসরি ভাগের বিষয়টি ছাড়াও তাঁদের অনেকেই লাভজনক পোস্টিং, প্রমোশন, অবসরের পর নানা সুযোগ সুবিধা সহ পুনর্নিয়োগ প্রভৃতির আশায় শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীদের পায়ে তেল মাখানোটাকে কর্তব্যের মধ্যেই ধরেন। শাসকদলের পোষা দুষ্কৃতীদের সব বেআইনি কাজ দেখেও চুপ করে থাকা, তাদের লুঠের ব্যবস্থা করে দেওয়া এগুলো সেই সব কর্তার অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে বিরোধীদের দেখলেই চোখ রাঙানো, সামান্য মিটিং মিছিল করতেও বাধা দেওয়া, হেনস্থা করা এ সবই পুলিশ এবং প্রশাসনের কর্তব্যের তালিকায় বেশ বড় অক্ষরে জ্বলজ্বল করে।

অবশ্য তৃণমূল বলতে পারে আমরা একা নই, এটাই দীর্ঘদিন ধরে দেশের শাসকদলগুলির বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। আজ কেন্দ্র এবং রাজ্যে প্রশাসন এবং পুলিশ, এমনকি সিবিআই-ইডি-র-এনআইএ ইত্যাদি তদন্ত সংস্থা পুরোপুরি শাসকদলের আজ্ঞাবাহী ভৃত্য বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারটা কোন দল চালাচ্ছে, তা বিজেপি না তৃণমূল, কংগ্রেস, ডিএমকে, শিবসেনা অথবা সিপিএম ইত্যাদি যাই হোক না কেন, পরিস্থিতির ফারাক বিশেষ নেই। পশ্চিমবঙ্গে ও কংগ্রেস-সিপিএম আমলে দুষ্কৃতীরা শাসকদলের আশ্রয়ে থাকলে কেমন বুক ফুলিয়ে ঘুরেছে তা অজানা নয়। কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে কলকাতার তৎকালীন নামকরা সমাজবিরোধীদের আনাগোনা এবং তাদের কাউন্সিলর থেকে মন্ত্রী পর্যন্ত হওয়ার ইতিহাস কি ভোলার? কংগ্রেসী আমলেই থানাগুলি শাসকদলের নির্দেশে চলতে শুরু করে। সিপিএম আমলে ১৯৮২ সালে বিজনসেতুতে ১৪ জন আনন্দমার্গীকে পুড়িয়ে মারা বা ২০০১ সালে পশ্চিম মেদিনীপুরের ছোট আঙারিয়ার ঘরে আগুন লাগিয়ে ১১ জনকে হত্যার ঘটনা আজও মানুষ ভোলেনি। ছোট আঙারিয়ার এই ঘটনায় সিপিএমের যে দুই নেতা অভিযুক্ত ছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী তাদের দলীয় 'সম্পদ' বলে অভিহিত করেছিলেন। কারও শাস্তি হয়নি। সিপিএম সরকারের আমলে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কুলতলি-জয়নগরে বারবার হত্যাকাণ্ড, লুঠপাট যারা চালিয়েছিল তাদের অন্যতম মাথা ছিলেন এক মন্ত্রী। একান্ত আলাপে সিপিএম নেতারা তা স্বীকারও করতেন। খুনিদের শাস্তি হয়নি। কিন্তু মিথ্যা মামলায় সরকার জেল খাটিয়েছে ওই এলাকার সর্বজনশ্রদ্ধেয় গণআন্দোলনের নেতাদের। থানা এবং শাসকদলের অফিসের পার্থক্য সিপিএম প্রায় মুছে দিয়েছিল। বিজেপির রেকর্ড হল গুজরাট গণহত্যা ঘটিয়েও শাস্তিভোগ দূরে থাক, সেদিনের গণহত্যার নায়করাই এখন কেন্দ্রীয় সরকারের হর্তাকর্তা। গুজরাট, কর্ণাটক, উত্তরাখণ্ড, আসাম, উত্তরপ্রদেশের মতো নানা রাজ্যে বিজেপি শাসনে পুলিশের পুরোপুরি দলদাসে পরিণত হওয়া, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন দিল্লি পুলিশের বিজেপির অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হওয়ার ঘটনাও অজানা কোনও তথ্য নয়।

প্রশাসনের ন্যূনতম নিরপেক্ষতা বজায় রাখা আজকের বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থায় এমনিতেই সম্ভব নয়। অতীতে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সরকার এবং প্রশাসকদের জনগণের সাথে কিছুটা হলেও সম্পর্ক রাখতে হত। জনগণের ভোটেরও তারা কিছুটা মূল্য দিতে বাধ্য হতেন। কারণ গণআন্দোলনের ফলে গণতান্ত্রিক চেতনার ন্যূনতম যে মান একেবারে সাধারণ মানুষের মধ্যেও ছিল তাকে উপেক্ষা করা পুরোপুরি তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আজ বুর্জোয়া ব্যবস্থার অবক্ষয় এতটাই যে, সর্বোচ্চ প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগ, আইন বিভাগ কারও জনগণের প্রতি কোনও দায়বদ্ধতা নেই। সরকারি দলগুলি জানে নির্বাচনে জেতার জন্য আজ প্রথম দরকার টাকা। তা হলেই মাসল পাওয়ার, মিডিয়া পাওয়ার, আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ারকে অক্লেশে কেনা যায়। ফলে একচেটিয়া মালিকদের টাকার থলি যেদিকে ঝোঁকে সেদিকেই ঝোঁকে তথাকথিত গণতন্ত্রের সবকিছু। মানুষের ন্যূনতম চেতনা, টিকে থাকা ছিটেফোঁটা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে আরও ক্ষয় ধরানোর জন্য শাসকদলগুলি চেষ্টা করে চলেছে। তারা চায় চরম শোষণে নিঃস্ব জনগণকে সামান্য কিছু সুবিধার লোভ দেখিয়ে নিজের লেজুড়ে পরিণত করতে। ন্যায্য অধিকারের দাবি তোলার বদলে সামান্য পাইয়ে দেওয়াটাকেই যেন সরকারের চরম বদান্যতার প্রকাশ বলে মেনে চুপ করে থাকে মানুষ। বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, রোজগারহীনতায় জর্জরিত সাধারণ মানুষ এর অসহায় শিকার। এরই সুযোগ নিয়ে একদলকে কিছু অনৈতিক সুবিধা পাইয়ে দিয়ে দলীয় মাফিয়ায় পরিণত করছে শাসকদলগুলি। তাদের এরা কাজে লাগায় আবার প্রয়োজনে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আর প্রশাসন? মালিক শ্রেণির পুরোপুরি আজ্ঞাবাহী দাস হিসাবে প্রশাসন ভালই জানে কখন কাকে মদত দিতে হয়, কখন চোখ ঘুরিয়ে নিতে হয়। যার প্রকাশ আমরা আজকের বাংলায় দেখছি।

আশার কথা সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের সময় যাঁরা প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছিলেন, সেই বুদ্ধিজীবীরা আবার প্রতিবাদে নেমেছেন। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জনসাধারণের মধ্য থেকেও দাবি উঠছে বগটুই, আনিস হত্যাকাণ্ডের তদন্ত শুধু নয়, দলদাস পুলিশের শাস্তি চাই, এর আসল কলকাঠি নাড়া চাঁইদের শাস্তি চাই। এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বেড়ে ওঠাটাই আজকের অন্ধকার পরিস্থিতিতে আলোর রেখা।

# এঁরা কি জনগণের প্রতিনিধি

*একের পাতার পর*

অধিকাংশ মানুষ কী ভাবে দিন কাটাচ্ছে তা তো তাঁদের অজানা নয়। বিরাট অংশের মানুষের রোজগার নেই। নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের দাম প্রতিদিন বাড়ছে। বেকার ছেলেমেয়েরা একটা কাজের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। জনগণের উপর পুঁজিপতি শ্রেণির শোষণ অতীতের সব মাত্রাকে ছাড়িয়ে গেছে। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে এ-সবের বিরুদ্ধে কী ভূমিকা পালন করছেন তাঁরা!

পার্লামেন্টারি ব্যবস্থার গোড়ার দিকে পুঁজিবাদ যখন একচেটিয়া স্তরে পৌঁছে সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেনি তত দিন রাজনৈতিক দলগুলি পুঁজিপতি শ্রেণির কোনও না কোনও গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করলেও জনস্বার্থকে আজকের মতো এমন করে পুরোপুরি ছুঁড়ে ফেলে দেয়নি। তখন কিছুটা হলেও জনস্বার্থে তাদের কাজ করতে হত। সেদিন প্রতিবাদের অধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বিচার ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের যে পতাকা তারা তুলে ধরেছিল, আজ সে-সব কিছুকেই তারা পদদলিত করছে। আজ পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদী স্তরে পৌঁছে পুঁজির ব্যাপক কেন্দ্রীভবন ঘটানোর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রকে একচেটিয়া পুঁজির লেজুড়ে পরিণত করেছে।

অন্য দিকে বুর্জোয়া-পেটিবুর্জোয়া দলগুলি তাদের দল চালানো, নির্বাচনী খরচ চালানো, নেতাদের বিলাসী জীবন চালানোর জন্য পুঁজিপতিদের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে শাসক এবং বিরোধী দলে কোনও ফারাক নেই। যে পুঁজিপতি শ্রেণির টাকায় তাঁদের দল চলে, তারই অঢেল খরচে নির্বাচিত হয়ে তাঁরা রাজার মতো জীবনযাপন করেন, সেই পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়ে তাঁরা কি আদৌ জনস্বার্থের পক্ষে দাঁড়াতে পারেন? তাই কি বিধানসভায় কি লোকসভা-রাজ্যসভায় কোনও রকম বিরোধিতা ছাড়াই অনায়াসে একের পর এক শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের স্বার্থবিরোধী আইন পাশ হয়ে যায়। জনগণের ভোটে নির্বাচিত এই সব প্রতিনিধিরা কেউ হাত তুলে সমর্থন করেন, কেউ নিরপেক্ষতার ভান করেন, কেউ প্রবল বিরোধিতার নাটক করে ওয়াক আউটের নাম করে আইন পাশের রাস্তা সহজ করে দেন। অন্য দিকে জনস্বার্থের সাথে সম্পর্কহীন বিষয়গুলিকেই গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে দেখিয়ে তুলকালাম বাধান, মারামারি করেন, পরস্পরকে গালিগালাজ করেন। এই ভাবে জনগণের চোখে ধুলো দিয়েই তাঁরা রাজনীতির কারবারি হয়ে ওঠেন। এ জিনিস শুধু এই প্রথম ঘটল না, কিছু দিন আগেই একবার কংগ্রেস পরে আবার সিপিএম বিধায়করা একই কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন। উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, তামিলনাড়ু প্রভৃতি নানা রাজ্যের বিধানসভায় যেমন এমন কাণ্ড ঘটেছে, তেমনই লোকসভাতেও বারে বারে কাগজ ছোঁড়াছুড়ি, ধাক্কাধাক্কি ঘটনা নিয়মিত ঘটে চলেছে। বাস্তবিক এই দলগুলির রাজনীতিতে জনস্বার্থই নেই তো, কার হয়ে তাঁরা তর্ক-বিতর্ক, আলাপ-আলোচনা করবেন। নীতির লড়াই কোথাও নেই, দুর্নীতির সংঘাত আছে। জনগণের সম্পদ কে কতখানি লুঠ করতে পারবে তারই প্রতিযোগিতা চলছে। আর যুক্তি যখন থাকে না, তখন পেশিশক্তিই হয়ে ওঠে একমাত্র ভরসা।

এই সব রাজনৈতিক দলগুলি আজ যেমন পুঁজিপতি শ্রেণির ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে, তেমনই রাজনীতিকে জনগণের সম্পদের অবাধ লুঠপাটের হাতিয়ারে পরিণত করে ফেলেছে। তাই রাজনীতিতে সৎ, দরদি, সংগ্রামী মানুষের পরিবর্তে বাহুবলী, সমাজবিরোধীদের ভিড় বাড়ছে। কোটি কোটি টাকায় বিক্রি হচ্ছে বিধানসভা লোকসভার প্রার্থীপদ। ফলে রাজনীতিতে নীতি-আদর্শের কোনও বালাই থাকছে না। সেদিন বিধায়করা নাকি বগটুই গণহত্যা নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন! যদি সত্যিই তা চাইতেন তা হলে এই আচরণ করতেন? আর আলোচনা কি-ই বা করতেন তাঁরা! যাঁরা সেদিন মারপিট করলেন তারা অনেকেই কিছুদিন আগেও অন্য দলের 'সম্পদ' ছিলেন। সুবিধা বুঝে জামা বদলেছেন। আর যে দলেই তাঁরা যান না কেন, যারা যেখানে ক্ষমতায় রয়েছে, সেখানে বগটুইয়ের মতো ঘটনা ঘটিয়েছেন। দলবদল আজ রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই এঁদের বিরোধ নীতিগত নয়, সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থেই। এই বিরোধের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতি হচ্ছে জনস্বার্থের, কারণ এর ফলে সেটাই পিছনে চলে যায়।

পুঁজিবাদী এই সমাজব্যবস্থা আজ পচে গিয়েছে। ইতিহাসের নিয়মে একদিন এই পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা এসেছিল। আজ সেই নিয়মেই তার ভূমিকা শেষ হয়ে গিয়েছে। শোষণ, লুণ্ঠন, দুর্নীতি, প্রতারণা, মিথ্যাচারকে ভিত্তি করে টিকে থাকা এই ব্যবস্থাকে যারাই সেবা করবে সেই রাজনৈতিক দল ও তার নেতাদের প্রতারক ও দুর্নীতিপরায়ণ না হয়ে উপায় নেই। এই ব্যবস্থায় একমাত্র যথার্থ শ্রমিক শ্রেণির দলের প্রতিনিধিরাই কিছুটা হলেও মানুষের জন্য ভূমিকা পালন করতে পারেন। পাঁচ বছর অন্তর একবার করে সরকার বদলে পুঁজিবাদের এই চরিত্র বদল করা যাবে না। মানুষের বাঁচার দাবিগুলি নিয়ে সংগ্রামী বামপন্থার রাস্তায় প্রবল গণআন্দোলন গড়ে তোলাই আজ পরিস্থিতি পরিবর্তনের একমাত্র রাস্তা।

## পি এফ সুদ কমে ৪৪ বছরে সর্বনিম্ন

# ‘অমৃত কালে’ বিজেপির উপহার

প্রধানমন্ত্রী এখন বলে চলেছেন, স্বাধীনতার ৭৫ বছরে দেশে এখন ‘অমৃত কাল’ চলছে। তাঁর অমৃত যে আসলে হলাহল তা আবার টের পেলেন শ্রমিক-কর্মচারীরা। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার পেনশন বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ফলে ১১-১২ মার্চ গুয়াহাটিতে দু’দিনের কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফান্ডের কেন্দ্রীয় অছি পরিষদের বৈঠককে ঘিরে পিএফ-এর অন্তর্গত সংগঠিত ক্ষেত্রের ৬ কোটি শ্রমিক-কর্মচারী এবং ৭৫ লক্ষ অবসরপ্রাপ্ত পেনশনভোগী কর্মচারীদের মধ্যে প্রবল আগ্রহ এবং আশার সঞ্চার হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল, কেন্দ্রীয় সরকারের অন্য প্রতিশ্রুতিগুলির মতো এটাও ভুয়ো। কেন্দ্রীয় সরকারের একতরফা সিদ্ধান্তে পি এফ-এর সুদ ৮.৫ শতাংশ থেকে কমে ৮.১ শতাংশ হয়ে গেল—যা ১৯৭৭-’৭৮ সালের পর ৪৪ বছরে সর্বনিম্ন। পেনশনের হারও বাড়ল না— সেই সর্বনিম্ন এক হাজার টাকাই থেকে গেল। শুধু বিষয়টি বিলম্বিত করার জন্য আর একটি এক্সপার্ট কমিটির হাতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সরকারের এ ধরনের স্বৈরতান্ত্রিক একতরফা সিদ্ধান্তে শ্রমিকদের মধ্যে চূড়ান্ত ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। কেন্দ্রীয় অছি পরিষদের মিটিংয়ে এ আই ইউ টি ইউ সি সহ অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনের প্রতিবাদে কানই দিলেন না কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তমান শ্রমমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব। দাবি উঠেছিল, ন্যূনতম পেনশন ৩০০০ টাকা হোক। কিন্তু নানা টালবাহানার পর তা মানা হল না। আসলে নির্বাচন শেষ, সরকারের প্রতিশ্রুতিও শেষ। এআইইউটিইউসি-র প্রতিনিধি বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য সুস্পষ্টভাবে হিসাব দেখিয়ে যুক্তি সহকারে বলেছিলেন, কেন পি এফ-এর সুদের হার অন্ততপক্ষে ৮.৫ শতাংশ হারে দেওয়া সম্ভব। তা সত্ত্বেও সুদ সর্বনিম্ন হল কেন?

আমাদের দেশের ধনকুবেররা ব্যাঙ্ক থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে, ফেরত দেয়নি। সরকার এই টাকা উদ্ধার করার চেষ্টাই করেনি তাদের মালিক-তোষণ নীতির জন্যই। বৃহৎ পুঁজিপতিদের ট্যাক্স ছাড়, হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যাঙ্কঋণ মকুব, সম্পদ কর ছাড়, সুদে ছাড়— এ সবের ফলেই রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প এবং ব্যাঙ্কগুলি রুগ্ন এবং দেউলিয়া হয়ে পড়ছে। ব্যাঙ্কে সুদের হার কমেছে। আর এটাকেই অজুহাত করে পেনশনের সুদও সরকার স্বৈরতান্ত্রিক কায়দায় কমিয়ে দিল।

এ ছাড়াও পিএফ-এর হাজার হাজার কোটি টাকা দাবিদারহীন অবস্থায় (আনক্লেমড এবং আনঅ্যাকাউন্টেড) পড়ে আছে। পি এফ-এর টাকা খাটিয়ে বহু কোটি টাকা সুদ পাচ্ছে সরকার এবং বহু ডেমারেজের টাকাও সরকার পায়। এই সব মিলিয়ে অন্ততপক্ষে ৮.৫ শতাংশ পিএফ-এর সুদ না দেওয়াটাই আশ্চর্যের।

স্বয়ংশাসিত ত্রিপাক্ষিক সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও ইপিএফও (এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন) কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রকের অঙ্গুলিহেলনে চলে। অর্থমন্ত্রকই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়— কেন্দ্রীয় অছি পরিষদের সিদ্ধান্তকে অতিক্রম বা অগ্রাহ্য করেই। ভারতের মতো পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণি এবং কর্পোরেটদের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির তোয়াক্কা না করে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঘটানো হচ্ছে। পিএফ এবং ইএসআই-এর মতো দেশের সর্ববৃহৎ সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার এক পয়সাও বরাদ্দ করে না। অথচ তারাই সব সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করে। পেনশন স্কিমে ভর্তুকি মাত্র ১.১৬ শতাংশ। শ্রমিক সংগঠনগুলির দাবি মেনে এই ভর্তুকি সামান্য বাড়ালেই ন্যূনতম পেনশন ৩০০০ টাকা হতে পারত। সরকার সেটা করেনি।

সরকার এতই নির্মম যে, অসংখ্য পরিযায়ী শ্রমিক, মৃত শ্রমিক, স্বল্পকালীন চাকরি করে বরখাস্ত শ্রমিক, বা যাঁরা নানা কারণে ক্লেইম করতে পারেননি, তাঁদের হাজার হাজার কোটি টাকা যা আনক্লেইমড বা দাবিদারহীন অবস্থায় পড়ে আছে, নাম-ঠিকানা, আইডি ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও সরকার খোঁজ করে তাঁদের টাকা তাঁদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার বিন্দুমাত্র উদ্যোগ নেয়নি। এমনকি এআইইউটিইউসি এই দাবি তোলায় এবং অছি পরিষদে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হওয়ার পরেও সরকার তা করেনি। বরং সরকার প্রস্তাব দিয়েছিল, যাঁরা ৮০ বছরের ঊর্ধ্বে সিনিয়র সিটিজেন পেনশনার, তাঁদের পেনশন এই আনক্লেইমড টাকা থেকেই বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। সরকার একবারও ভাবল না যে কার টাকা তারা কাকে দিচ্ছে! দাবিদারহীন টাকারও তো দাবি আসতে পারে—সরকার তখন কী করবে? শ্রমিক-কর্মচারীদের বঞ্চিত করে তাদেরই একাংশের বিরুদ্ধে একাংশকে লড়িয়ে দেওয়ার হীন চাতুরি ছাড়া একে কী-ই বা বলা যায়!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দুনিয়া জুড়ে শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিবিরের উত্থান ঘটেছিল এবং পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি নিজেদের মধ্যেই পারস্পরিক যুদ্ধের ফলে হীনবল হয়ে পড়েছিল। মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন দুনিয়াকে দেখিয়েছিল, কী ভাবে মানুষের দ্বারা মানুষের উপর শোষণ নির্মূল করা যায়। এই শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা শ্রমিক শ্রেণির জীবনের প্রয়োজনের ভিত্তিতে তাদের অধিকার সুনিশ্চিত করেছিল। সেই সময় বিশ্বজোড়া সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপুল ও যুগান্তকারী অগ্রগতি ও মানবমুক্তির প্রভাব পুঁজিবাদী দুনিয়াতেও আলোড়ন তুলেছিল। এর ফলে শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে সমাজতন্ত্রের প্রতি প্রবল আকর্ষণ দেখে তাদের ভুলিয়ে রাখতে পুঁজিবাদী দুনিয়াও দেখাতে চেয়েছিল যে তাদেরও মানবিক মুখ আছে। আমাদের দেশেও সেই সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রভাবেই স্বাধীনতার সময় ও তার পরপরই শ্রমিক কল্যাণে প্রণীত হয়েছিল সামাজিক সুরক্ষা, কাজের সুরক্ষা, শ্রমিক কল্যাণমূলক আইনগুলি। যেমন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাস্টার অ্যাক্ট ১৯৪৭, ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্ট ১৯৪৮, প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যাক্ট ১৯৫২, ইএসআই অ্যাক্ট ১৯৪৯ ইত্যাদি শ্রমিকদের অধিকার সংক্রান্ত আইন। প্রতিটি শ্রম আইনের পিছনেই আছে শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামের ইতিহাস। কিন্তু আজ পুঁজিবাদ চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল এবং সংকট জর্জরিত। সমাজতান্ত্রিক শিবিরও এখন নেই। ফলে একমেরু পুঁজিবাদী বিশ্ব নিয়ে এসেছে বিশ্বায়ন, উদারিকরণ ও বেসরকারিকরণের সর্বগ্রাসী পুঁজিবাদী নীতি। সর্বোচ্চ মুনাফার স্বার্থে শ্রমিক শোষণ তীব্রতর হচ্ছে। সরকারগুলিও এই কর্পোরেট এবং পুঁজিপতিদের সেবাদাসে পরিণত হয়েছে। এই অবস্থায় সামাজিক সুরক্ষার আইনগুলির উপর আঘাত নেমে এসেছে।

একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে আমাদের দেশের সরকার শ্রম আইনের সংস্কার করে মালিক শ্রেণির স্বার্থে ‘শ্রম কোড’ জারি করেছে। সামাজিক সুরক্ষার আইনগুলিকে গুরুত্বহীন করে দিচ্ছে। এ সবের মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণির বহু সংগ্রামে অর্জিত অধিকারগুলি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে মালিক শ্রেণির স্বাচ্ছন্দ্য, লগ্নিবান্ধব নীতি ইত্যাদির নামে নানা সুযোগ-সুবিধা মালিকদের দিচ্ছে। লেবার কোডে পিএফ তহবিলে মালিকের দেয় ১২ শতাংশের বদলে ১০ শতাংশ করা হয়েছে। পিএফ এবং ইএসআই-কে ঐচ্ছিক করে দিয়ে বেসরকারি মিউচুয়াল ফান্ড বা মেডিকেল বিমা ইত্যাদির ব্যবসা চালু করতে চাইছে। এ ভাবেই মালিক শ্রেণির স্বার্থে পিএফ এবং ইএসআই-এর প্রয়োগ বা কভারেজকেও মালিকদের ইচ্ছাধীন করার নীতি প্রবর্তন করেছে। এর ফলে লক্ষ লক্ষ চটকল শ্রমিক, চা শ্রমিক, বিড়ি শ্রমিক এবং আরও অন্যান্য ক্ষেত্রের সামাজিক সুরক্ষা ও অন্যান্য অধিকারহীন শ্রমিকের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। ব্যাপক হারে বাড়ছে কন্ট্রাক্ট শ্রমিক, আউটসোর্সিং, ফিক্সড টার্ম শ্রমিক এবং দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা। যারা শ্রম আইনের আওতার বাইরে থাকবে। মালিক শ্রেণিকে খুশি করতে সরকার ইন্সপেকশন, ভিজিলেন্সও তুলে দিয়েছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না, সরকারের আসল মালিক কারা!

এ আই ইউ টি ইউ সি-র সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং পিএফ অছি পরিষদের সদস্য কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য বলেন, পিএফ-এর সুদ কমানো, ন্যূনতম পেনশন না বাড়ানোর বিরুদ্ধে আমাদের তীব্র প্রতিবাদ ও আপত্তি সরকার কানেও তোলেনি। বঞ্চিত হল শ্রমিকরা। তাঁদের ভবিষ্যনিধির সঞ্চয়ে কোপ পড়ল।

১৯৫২ সালে পিএফ আইনেই বলা হয়েছিল যে, শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয়েছিল, এটা শ্রমিকদের কষ্টার্জিত সঞ্চয়। একজন শ্রমিকের যদি দশ হাজার টাকা মজুরি হয়, তা হলেও তাকে মাসে ১২ শতাংশ অর্থাৎ ১২০০ টাকা বাধ্যতামূলক সঞ্চয় হিসাবে পিএফ-এ টাকা জমা রাখতেই হবে। অর্ধভুক্ত থেকে বা জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনগুলিকে কাটছাঁট করেও তাই টাকা তাকে জমা রাখতে হয়। এ জন্য পিএফ-এর এই সঞ্চয়ের সাথে অন্যান্য উদ্বৃত্ত সঞ্চয়ের কোনও তুলনাই চলে না এবং এই কারণেই এর সুদ কমানো চলে না।

যতদূর সম্ভব সর্বোচ্চ সুদ শ্রমিকরা পেতে থাকলেই সামাজিক সুরক্ষা অর্থবহ হতে পারে। অথচ সরকার সেই সুদে বা সঞ্চয়েই কোপ মারছে এবং পুঁজিপতিদের নানা ছাড় দিচ্ছে। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন সরকারের এই শ্রমিক স্বার্থবিরোধী নীতিকে আড়াল করতে গিয়ে, ব্যাঙ্কের সঞ্চয়, মিউচুয়াল ফান্ড ইত্যাদি অন্যান্য উদ্বৃত্ত সঞ্চয়ের সুদের হারকে গুলিয়ে দিয়ে চালাকির সাথে মানুষকে বোকা বানাতে চাইছেন। সরকারের এই নীতি এবং দৃষ্টিভঙ্গি চূড়ান্ত জনস্বার্থ বিরোধী পুঁজিবাদী নীতি—যা শ্রমিক কল্যাণের নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সরকার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এর সুরাহা হবে না। একমাত্র সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনই পারে শ্রমিক শ্রেণিকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে। এই ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধির কঠিন সময়ে সঞ্চয়ের সুদে এবং পেনশনে আঘাতের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর করেই সরকারের স্বৈরাচারী পদক্ষেপের মোকাবিলা করতে হবে।

# শহিদ ই আজম ভগৎ সিং স্মরণ

১৯৩১-এর ২৩ মার্চ শহিদের মৃত্যু বরণ করেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের আপসহীন ধারার তিন বীর বিপ্লবী ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরু। দিল্লি সংলগ্ন সবোলি গ্রামে ২৩ মার্চ ‘শহিদ ভগৎ সিং সংঘর্ষ সমিতি’-র উদ্যোগে এই শহিদদের আত্মদান স্মরণে এক মশাল মিছিল নহরওয়ালে চক থেকে শুরু হয়ে ভগৎ সিং মূর্তির পাদদেশে গিয়ে শেষ হয়। গ্রামের বহু তরুণ-যুবক শহিদদের ছবি, পোস্টার, মশাল ও মোমবাতি হাতে নিয়ে মিছিলে সামিল হন।

মধ্যপ্রদেশে তিনদিন ধরে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে স্মরণ করলেন এআইইউটিইউসি অনুমোদিত ভগৎ সিং অখ্বর হকার্স ইউনিয়নের সদস্যরা। প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, সভা, সাইকেল মিছিল সহ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

# দিল্লিতে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সমাবেশ

জনবিরোধী বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ ও সংশোধনী বিল ২০২১ প্রত্যাহারের দাবিতে ৪ এপ্রিল অল ইন্ডিয়া ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে সারা ভারত থেকে আগত গ্রাহক প্রতিনিধিরা দিল্লির যন্তরমন্তরে বিক্ষোভ দেখান ও বিদ্যুৎমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেন। দেশের ১৫টি রাজ্য থেকে কয়েক শত প্রতিনিধি এই বিক্ষোভ সমাবেশে যোগ দেন।

সভাপতিত্ব করেন কমিটির কার্যকরী সভাপতি রমেশ পরাশর। সাধারণ সম্পাদক সমর সিনহা বিদ্যুৎ শিল্পের বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী দীর্ঘস্থায়ী গ্রাহক আন্দোলন গড়ে তুলতে রাজ্যে রাজ্যে জেলা, ব্লক, গ্রামস্তর ধরে গ্রাহক কমিটি গড়ে তোলার আহ্বান জানান। কেরালা, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, দিল্লি, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব সহ বিভিন্ন রাজ্যের বক্তারা প্রি-পেড মিটার লাগানো, ক্রস সাবসিডি তুলে দেওয়া, লাভজনক বিদ্যুৎ শিল্পকে আদানি,আম্বানি, গোয়েঙ্কা, টাটা প্রভৃতি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কাছে বিক্রি করে দেওয়ার বিরুদ্ধে ব্যাপক গ্রাহক আন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

সমাবেশে সংযুক্ত কিসান মোর্চার প্রতিনিধি সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি অফ ইলেক্ট্রিসিটি ইঞ্জিনিয়ারস অ্যান্ড এমপ্লয়িজ-এর পক্ষ থেকেও গ্রাহক আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে বার্তা পাঠানো হয়।

# ওষুধের দাম বৃদ্ধি চিকিৎসাকে ব্যাহত করবে

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি মেনে ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি ওষুধের দাম ১১ শতাংশের বেশি বাড়ানোর সুপারিশ করেছে। এই প্রসঙ্গে ২৭ মার্চ সার্ভিস ডক্টর্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, এর ফলে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা ব্যাহত হবে।

তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার ড্রাগ প্রাইস কন্ট্রোল অর্ডার প্রতি বছর পরিবর্তন করার ফলে ওষুধ কোম্পানিগুলো প্রতি বছরই দাম বাড়ানোর সুযোগ পাচ্ছে। যদিও বর্তমানে অত্যাবশ্যকীয় নয় এমন ওষুধের মূল্য নির্ধারণের ক্ষমতা সরকার ছেড়ে দেওয়ায় কোম্পানিগুলো এইসব ওষুধের দাম যথেচ্ছ ভাবে বৃদ্ধি করে চলেছে। অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে এতদিন সরকারের একটা নিয়ন্ত্রণ ছিল। ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটির মাধ্যমে সরকার এবার সে নিয়ন্ত্রণটুকুও তুলে নিল। সার্ভিস ডক্টর্স ফোরামের অভিমত, কর্পোরেট ওষুধ ব্যবসায়ীদের অত্যধিক মুনাফা সুনিশ্চিত করতেই সরকারের এই পদক্ষেপ। ইতিমধ্যেই ওষুধের দাম বহুগুণ বেড়েছে, এখন তা আরও বেড়ে সাধারণ মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে। অসংখ্য মানুষ কার্যত বিনা চিকিৎসায় মারা যাবেন।

# ওষুধের দামবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ বাগনানে

কেন্দ্রীয় সরকার ৮০০টি জীবনদায়ী ওষুধের দামবৃদ্ধির যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাল এস ইউ সি আই (সি) বাগনান লোকাল কমিটি। ৩০ মার্চ বাগনান স্টেশন ও বাসস্ট্যান্ডের কাছে দুটি পথসভায় এই কালা সার্কুলারের প্রতিলিপিতে আগুন দেন দলের প্রবীণ সংগঠক কমরেড অরূপ রতন সাহা। বক্তব্য রাখেন হাওড়া গ্রামীণ জেলা কমিটির সম্পাদিকা কমরেড মিনতি সরকার ও জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সরোজ মাইতি।

# ওয়াটার ক্যারিয়ার সুইপারদের ডেপুটেশন

হাওড়া জেলার ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের অধীন জেলা সহ আর আই দপ্তরে (ওয়াটার ক্যারিয়ার ও সুইপার) 'কর্মবন্ধুরা' নিয়মিত কর্মচারীর স্বীকৃতি, স্যাটের আদেশ অনুযায়ী অন্যান্য জেলার মতো ১৯৯৯ সাল থেকে বকেয়া মেটানো, পুজোর বোনাস, মৃত বা অক্ষম কর্মচারীর পোষ্যকে ওই পদে নিয়োগের দাবিতে ১৭ মার্চ হাওড়ার বঙ্গবাসী মোড় থেকে মিছিল করে ডিএলআরও-র কাছে দাবিপত্র পেশ করেন। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন ওয়াটার ক্যারিয়ার অ্যান্ড সুইপার ইউনিয়নের (কর্মবন্ধু) রাজ্য সভাপতি সমরেন্দ্রনাথ মাঝি এবং ইউনিয়নের হাওড়া জেলার যুগ্ম সম্পাদক সমীর দোলুই ও নিখিল বেরা। উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের বিভিন্ন ব্লকের নেতৃবৃন্দ। ডিএলআরও কর্মচারীদের বকেয়া টাকা শীঘ্রই মেটানোর প্রতিশ্রুতি দেন।

# এআইকেকেএমএস-এর মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলন

সারের কালোবাজারি রোধ, সার-বীজ-কীটনাশক, ডিজেল, বিদ্যুৎ সহ সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি রোধ, ন্যায্য দামে পর্যাপ্ত পরিমাণে ডিএপি ও ইউরিয়ার যোগান সুনিশ্চিত করা, জুট করপোরেশন অব বেঙ্গল গঠন করে পাট চাষিদের কাছ থেকে সরকারি ব্যবস্থায় ন্যায্য মূল্যে পাট কেনা, এনরেগা প্রকল্পে জব কার্ড হোল্ডারদের কমপক্ষে ২০০ দিন কাজ ও দৈনিক ৪০০ টাকা মজুরি, জমির রেকর্ড সংশোধনে বিএলআরও অফিসের সীমাহীন দুর্নীতি বন্ধ, ধান উৎপাদক এলাকাগুলিতে পর্যাপ্ত ধান ক্রয়কেন্দ্র খুলে চাষিদের থেকে সরকারি উদ্যোগে নির্ধারিত মূল্যে ধান কেনা, পেঁয়াজ, আলু ও সবজি চাষিদের জন্য হিমঘরের ব্যবস্থা ইত্যাদি দাবি নিয়ে দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠনের দশম মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলন ২০ মার্চ বেলডাঙার পাঠভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড সেখ খোদাবক্স সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর জেলা সম্পাদক কমরেড সাধন রায়। প্রধান আলোচক ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ। তিনি ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের নানা দিক এবং সংগঠনের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, আরও বৃহত্তর কৃষক আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

আলোচনা করেন কমরেড সেখ খোদাবক্স এবং সংগঠনের রাজ্য সহ সভাপতি কমরেড মদন সরকার। কমরেড অমল ঘোষকে সভাপতি, কমরেড মনিরুল ইসলামকে সম্পাদক করে ৩৪ জনের জেলা কমিটি ও ৩৯ জনের জেলা কাউন্সিল গঠিত হয়।

## ছাত্রীর উপর পাশবিক নির্যাতনের প্রতিবাদ

*উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাটে মাটিয়া থানা এলাকায় ১১ বছরের নাবালিকা ছাত্রীর উপর পাশবিক নির্যাতনের প্রতিবাদে ৩০ মার্চ এ আই এম এস এস, এ আই ডি এস ও এবং এ আই ডি ওয়াই ও-র পক্ষ থেকে জেলার এসপি অফিস ঘেরাও*

# খুন-সন্ত্রাসের প্রতিবাদ বরুণ বিশ্বাস স্মৃতিরক্ষা কমিটির

রাজ্য জুড়ে খুন-সন্ত্রাসের যে ভয়ঙ্কর পরিবেশ তৈরি হয়েছে তার প্রতিবাদে রাস্তায় নামল 'বরুণ বিশ্বাস স্মৃতি রক্ষা কমিটি'। রামপুরহাটে নারী ও শিশুদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের শাস্তি এবং আমতার প্রতিবাদী ছাত্র নেতা আনিস খানের হত্যার প্রতিবাদে ২৬ মার্চ কলকাতায় বরুণ বিশ্বাসের স্কুল মিত্র ইনস্টিটিউশনের গেট থেকে কলেজ স্কোয়ার বিদ্যাসাগর মূর্তি পর্যন্ত ধিক্কার মিছিলে পা মেলান কমিটির সভানেত্রী অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার, বিশিষ্ট চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বিজ্ঞান বেরা, সুটিয়া প্রতিবাদী মঞ্চের সভাপতি ননীগোপাল পোদ্দার, শিক্ষক অনাথ মৃধা, সমাজকর্মী জ্ঞানতোষ প্রামাণিক প্রমুখ। প্রতিবাদী কবিতা পাঠ করেন 'শোহরত' সাহিত্য পত্রিকার সদস্যরা।

*ডিজেল, পেট্রল, রান্নার গ্যাসের দামবৃদ্ধির প্রতিবাদে ২৬ মার্চ বাঙ্গালোরে বিক্ষোভ*

# দেশজোড়া ধর্মঘটে শ্রমিক আন্দোলন তীব্রতর করার আহ্বান

*সুরাট, গুজরাট* *কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া* *পাটনা, বিহার*

## ধর্মঘট সফল করার জন্য
## জনগণকে অভিনন্দন এআইইউটিইউসি-র

এআইইউটিইউসি সহ দশটি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন এবং ফেডারেশনগুলির আহ্বানে ২৮ ও ২৯ মার্চের সারা দেশব্যাপী ধর্মঘট সফল করার জন্য এআইইউটিইউসি-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত ২৯ মার্চ এক বিবৃতিতে জনসাধারণকে অভিনন্দন জানান।

তিনি বলেন, পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের নীতি অনুসরণ করে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে একের পর এক শ্রমিকবিরোধী, জনবিরোধী পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে। সরকারি সংস্থাগুলির বেলাগাম বেসরকারিকরণ ও ব্যবসায়ীকরণ করে চলেছে এই সরকার। পরিণামে ছাঁটাই কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে কর্মহীনতার সমস্যা আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। শ্রমিকদের কঠিন সংগ্রামে অর্জিত শ্রম-আইনগুলি বাতিল করে একচেটিয়া কারবারিদের ব্যবসায় সুবিধার অজুহাতে যেভাবে তারা ভয়ঙ্কর শ্রম-কোড চাপিয়ে দিচ্ছে, তাতে শ্রমিক সংগঠন ও মেহনতি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলির শেষ চিহ্নও লুপ্ত হবে। সমস্ত ধরনের অনৈতিক ও অগণতান্ত্রিক উপায় অবলম্বন করে সম্প্রতি কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে জিতেছে বিজেপি। এরই জোরে কেন্দ্রের এই শাসক দল পেট্রল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস সহ সমস্ত প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

বিবৃতিতে কমরেড দাশগুপ্ত বলেন, স্কিম ওয়ার্কার সহ সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের সমস্ত বিভাগের শ্রমিকদের ওপর যে নির্মম শোষণ ও দমন-পীড়ন চলছে তাতে দেশ জুড়ে ঐক্যবদ্ধ, শক্তিশালী আন্দোলন লাগাতার ভাবে গড়ে তোলার অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তিনি বলেন, সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘটের এই সাফল্য দেশের মেহনতি মানুষের শ্রেণিসংগ্রাম তীব্রতর করার রাস্তা তৈরি করবে। এআইইউটিইউসি-র সর্বভারতীয় কমিটি দেশের খেটে-খাওয়া মানুষের কাছে বৃহত্তর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে দ্রুত এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে।

*ধর্মঘটের প্রচারে লরি পরিবহণ শ্রমিকরা, কলকাতা*

## মধ্যপ্রদেশ রাজ্য যুব সম্মেলন

ক্রমবর্ধমান বেকারি, চুক্তিতে নিয়োগ, সরকারি সংস্থার বেসরকারিকরণ এবং মদ ও অশ্লীলতা প্রসারের বিরুদ্ধে ভোপালের গান্ধী ভবনে ২৭ মার্চ অনুষ্ঠিত হল এআইডিওয়াইও-র দ্বিতীয় মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সম্মেলন।

প্রকাশ্য সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (সি) ভোপাল জেলা সম্পাদক মুদিত ভাটনগর। প্রতিনিধি সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত কার্টুনিস্ট মনসুর নকভি। প্রধান বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই (সি)-র মধ্যপ্রদেশ রাজ্য কমিটির সদস্য প্রদীপ আর বি। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রাক্তন সর্বভারতীয় সহ সভাপতি জুবের রব্বানি ও সর্বভারতীয় সভাপতি নিরঞ্জন নস্কর। সম্মেলন থেকে রাজ্য সভাপতি ও রাজ্য সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন যথাক্রমে সিদ্ধান্ত কুমার সাহু ও প্রমোদ নামদেব।

*ধর্মঘটের দিন শিলিগুড়িতে এআইইউটিইউসি-র মিছিল*

## ধর্মঘটের দিন গোয়ালিয়রে
## বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিক্ষোভ মিছিল

১০টি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনের ডাকে ২৮ ও ২৯ মার্চ দেশজোড়া ধর্মঘটের সমর্থনে গোয়ালিয়রে 'মধ্যপ্রদেশ বিজলি উপভোক্তা অ্যাসোসিয়েশন'-এর আহ্বানে বিক্ষোভ মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ইন্দরগঞ্জ চৌরাহে সমবেত হয়ে বিশাল এই মিছিল বিদ্যুৎ দপ্তর পর্যন্ত যায় এবং সেখানে বিক্ষোভ দেখানো হয়। জনবিরোধী বিদ্যুৎ বিলের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়। গ্রাহক সংগঠন ছাড়াও বিদ্যুৎ ফেডারেশন, বিদ্যুৎ পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন সহ আরও কয়েকটি সংগঠনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপভোক্তা অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্যনেত্রী রচনা আগরওয়াল বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ ও বিদ্যুৎ আইন সংশোধনী ২০২১-এর তীব্র নিন্দা করে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের রাস্তা পরিষ্কার করছে। কর্মসূচিটি পরিচালনা করেন উপভোক্তা অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সংযোজক রূপেশ জৈন।

*ধর্মঘটের দিন*
*উত্তর ২৪ পরগণার*
*হাবড়ায় রাস্তা অবরোধ*

*ধর্মঘটের দিন*
*কলকাতায় মিছিল*

# পাঠকের মতামত

## আমার ধারণা বদলে গেল

এই চিঠি আমি লিখছি নিজের তাগিদেই। আগে আপনাদের দলের কর্মীদের কাছে কয়েক বার শুনেছিলাম যে মিডিয়া নাকি আপনাদের প্রচার দেয় না। উত্তরে প্রতিবারই আমি বলেছি, কেন দেবে না, আপনারা দেওয়ার মতো প্রোগ্রাম করুন, তা হলেই দেবে। এ-বার আমার সে ভুল ভেঙে গেল। ২২ মার্চ আপনাদের বিক্ষোভ-মিছিল আমি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে পুরোটা দেখেছি। এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে রাস্তা উপচে মিছিল গেছে। আমার মতো আরও অজস্র মানুষ দাঁড়িয়ে মিছিল দেখেছে। দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, এত মানুষ এসেছে এস ইউ সি আইয়ের মিছিলে! পরে ভাবলাম, হবে না-ই বা কেন, এরাই তো একমাত্র সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলি নিয়ে লড়াই করে। আপনাদের প্রচার গত এক মাস ধরে আমি লক্ষ করেছি। মূল্যবৃদ্ধি থেকে বেকারত্ব, বেসরকারিকরণ থেকে ফসলের দাম—মানুষের জীবনের সব দাবিগুলিই ছিল সেই প্রচারে। মানুষের সাড়াও আমি লক্ষ করেছি। আমার পরিচিত কিংবা বন্ধুবান্ধবরা অনেকেই স্বীকার করেন আপনাদের সিরিয়াসনেসের কথা। তাঁরা প্রায় সকলেই বলেন, অন্য দলগুলো যখন শুধু গদি নিয়ে কাড়াকাড়ি করে চলেছে, তখন এই একটা দলই নিষ্ঠা এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে।

মিছিলে ছাত্র-যুবদের বিরাট অংশগ্রহণ আমাকে খুবই উৎসাহিত করেছে। আন্দোলনের মিছিলে এত ছাত্র-যুবক আমি খুব কমই দেখেছি। বেকারদের কাজের দাবিতে কিংবা সবার জন্য শিক্ষার দাবিতে বলিষ্ঠ স্লোগান যখন তারা তুলছিল, তখন অদ্ভুত একটা আশার ঢেউ মনের মধ্যে আছড়ে পড়ছিল। দীর্ঘ দিন ধরে জমে থাকা হতাশাগুলো যেন ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। যখন তাঁরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছিলেন, সরকার পরিবর্তন নয়, সংগ্রামী বামপন্থাই মুক্তির রাস্তা, তখন যেন আমার ভেতরে একটা ভূমিকম্পের পূর্বাভাস পাচ্ছিলাম। হঠাৎ পাশে দাঁড়ানো মানুষটি আমাকে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, কত লোক হবে বলুন তো? আমি বললাম, আপনিই বলুন না। তিনি মিছিলের থেকে চোখ না সরিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, তা এক লাখ তো হবেই। লোকসংখ্যা নিয়ে আমার কোনও অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু তাঁর কথাটা আমিও যেন অবিশ্বাস করতে পারলাম না। লাখো মানুষের উপস্থিতির কথা শুনে কেন জানি না মনে কেমন একটা তৃপ্তি অনুভব করলাম। ভদ্রলোক বললেন, দেখবেন, কাল সব কাগজে এই বিরাট মিছিলের ছবি এবং খবর প্রথম পাতাতেই থাকবে। আমিও এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম। দেখলাম বেশ কয়েকটা ইলেকট্রনিক মিডিয়া ছবি তুলছে। ভাবলাম, নিশ্চয় ওরা লাইভ সম্প্রচার করছে। কারণ এত বড় খবর আজ তো ওরা আর কিছু পাবে না!

ধীরে ধীরে মিছিল শেষ হল। বাড়ির পথ ধরলাম। ফিরেই টিভিটা চালিয়ে দিলাম। বহুল প্রচলিত চ্যানেলটাই আগে খুললাম। বিজ্ঞাপন চলছে। অপেক্ষা করতে থাকলাম। বিজ্ঞাপন শেষ হলেই নিশ্চয় মিছিলের ছবি দেখাবে। কিন্তু, কই না তো। এক ফিল্মস্টারের ইন্টারভিউ চলছে। হতে পারে। হয়তো পূর্বনির্ধারিত, তাই দেখাচ্ছে। আচ্ছা দেখি তো অন্য চ্যানেলগুলো। একের পর এক ঘোরাতে থাকলাম। না, কেউই দেখাল না। কী করে হয়, কোনও চ্যানেলই দেখাল না এত বড় একটা প্রোগ্রাম? এই না দেখানোর অস্বস্তি ঘুমের মধ্যেও আমাকে তাড়িত করছিল।

ঘুম ভাঙল অন্য দিনের থেকে একটু আগেই। কাগজওয়ালা আমাদের বাড়িতে কাগজ দেয় খুব ভোরে। দৌড়ে গেলাম বারান্দায়। কাগজটা তুলেই প্রথম পাতায় চোখ রাখলাম। কই? এ তো রামপুরহাটের পুড়ে যাওয়া বাড়ির ছবি। হতেই পারে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর। নিশ্চয় ভেতরে আছে। পাতা উল্টে চললাম। কোথাও কোনও ছবি বা খবর দেখলাম না। দৌড়ে গেলাম পাড়ার কাগজের স্টলে। একটার পর একটা কাগজের পাতা ওল্টাতে থাকলাম। কোনও কাগজে নেই। মনে একটা বিরাট ধাক্কা খেলাম। তবে কি আপনাদের কথাই সত্যি! আপনাদের দলের খবর-ছবি না দেওয়াটা তবে সত্যিই মালিকদের পরিকল্পিত! পাড়ায় আপনাদের কর্মীদের সঙ্গে কত তর্ক হয়েছে। তাঁরা বলতেন, আমরা যেহেতু শোষিত মানুষের স্বার্থের কথা বলি, তাই পুঁজিপতিদের পরিচালিত মিডিয়া আমাদের প্রচার দেয় না। আমাদের শক্তিবৃদ্ধির কথা সামনে আনতে চায় না। আমি এ কথা বিশ্বাস করতাম না। ভাবতাম এ কি হতে পারে! মিডিয়া তো সবার কথাই বলে। কত গুরুত্বহীন দল, তাদের কথা ফলাও করে প্রচার করে। সারাক্ষণ তিলকে তাল করে তোলে। অথচ এত বড় একটা মিছিল, যা সাধারণ মানুষের জীবনের ন্যায্য দাবিগুলিকে তুলে ধরেছে, তার কোনও খবর তারা প্রকাশ করল না। আজ বুঝলাম আপনাদের কথাই ঠিক। কারণ, এর পিছনে অন্য কোনও যুক্তি মনের মধ্যে বহু খুঁজেও পেলাম না। আমার ধারণা বদলে গেল।

মনের উদ্বেগ হালকা করার জন্যই আপনাদের কাগজের দপ্তরে চিঠি লিখলাম। সঙ্গে অনুরোধ রাখলাম, আপনারা নিজেদের দৈনিক কাগজ এবং চ্যানেল তৈরি করুন। আমি আমার সাধ্যমতো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেব।

**অবিনাশ চৌধুরী,** কলকাতা-৯

## মিছিলে আমিও

২২ মার্চ সেই বহু প্রতীক্ষিত মহামিছিলের সাক্ষী হলাম। শিক্ষার বেসরকারিকরণ, গৈরিকীকরণ, বেকারত্ব বৃদ্ধি এবং শ্রমিক ছাঁটাই, মাদক দ্রব্যের ঢালাও ব্যবসা, বিদ্যুৎ সহ পেট্রোপণ্যের দাম বৃদ্ধির মতো বহু জ্বলন্ত সমস্যার শিকার সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের দাবিতে মিছিল এগোল হেদুয়া পার্ক থেকে ধর্মতলার দিকে। চেনা রাস্তা। আরও সরল করে বললে রোজকার যাতায়াতের পরিসর। কতবারই তো বাসে, হেঁটে, মেট্রো কিংবা ট্রামে যাতায়াত করেছি। তবে আজ সেই চেনা রাস্তাটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিভিন্ন জেলা থেকে আসা কমরেডদের ভিড়ে ঠাসা রাজপথ। রাজপথের দু'ধারে পড়ে থাকা অভুক্ত শিশু, পোড়া হাঁড়ি, ছেঁড়া কাপড়ের তালিমারা জামাকাপড়ের মানুষগুলির মুখও যেন মিশে গিয়েছিল মিছিলের সাথে। ওদের বেঁচে থাকার দাবিও মিছিলের দাবির সাথে মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছিল।

শয়ে শয়ে মানুষের হাতে লাল পতাকা আর ফেস্টুন। একই দাবিতে হাজার হাজার মুষ্ঠিবদ্ধ হাত যেন আকাশ ছুঁতে চাইছে। প্রখর রোদ, গলা-ফাটা তেষ্টা, পুলিশি পাহারা ওদের থামাতে পারে না। মিছিলে হাঁটছি আট থেকে আশি সবাই।

এত বড় জনস্রোতে কারও কারও কিছু অসুবিধা হয়তো ঘটেছে। কাজে যাওয়ার পথে কাউকে হয়তো কিছু সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। তবু সব ছাপিয়ে এই সুসজ্জিত, শান্তিপূর্ণ মিছিলের প্রতি কোনও বিরূপতা চোখে পড়েনি। বরং সহযোগিতাই করেছেন প্রায় সকলে। এই প্রথমবার এক বিপুল জনস্রোতে নিজেকে খুব সুরক্ষিত বলে মনে হল। কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে খুঁজতে ইচ্ছে করেনি। যার সঙ্গেই দেখা হয়েছে, হাসিমুখে কমরেড বলে সম্বোধন করেছেন। জলের বোতল এগিয়ে দিয়েছেন অচেনা মুখ। এ যেন রক্তের সম্পর্ক ছাপিয়ে আরও অনেক গভীর সম্পর্ক। ব্যক্তিস্বার্থ থেকে বেরিয়ে এসে যৌথ স্বার্থের কথা ভাবতে শেখার প্রথম ধাপ। এক অনাবিল আনন্দ। আকাশ-বাতাস কাঁপানো ইনকিলাবের স্লোগান যেন দিন বদলের দৃপ্ত অঙ্গীকার।

**প্রিয়াঙ্কা চ্যাটার্জী,** কলকাতা-৪

## জাতীয় শিক্ষানীতি ও পিপিপি মডেল বাতিলের দাবিতে পদযাত্রা

৩১ মার্চ অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির ডাকে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত পদযাত্রা করে রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হল। পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, অভিভাবক সহ সহস্রাধিক মানুষের দৃপ্ত মিছিলে মুখরিত হল কলকাতার রাজপথ। শিক্ষার প্রাণসত্তা হরণকারী জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ বাতিল ও রাজ্য সরকারের পিপিপি মডেল চালু করে স্কুল শিক্ষাকে বেসরকারিকরণ করার চক্রান্তের প্রতিবাদে এবং সমস্ত শিক্ষক পদ অবিলম্বে পূরণ করা, পাশ-ফেল চালু করা, ন্যাশনাল টেস্ট এজেন্সির মাধ্যমে স্নাতক স্তরে প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করা, অনলাইন শিক্ষার পরিবর্তে শ্রেণিকক্ষ-শিক্ষা সুনিশ্চিত করা, ব্লেন্ডেড মোড শিক্ষা বাতিল করা প্রভৃতি দাবি নিয়ে বিগত এক মাস ধরে রাজ্যের শহর-গঞ্জ থেকে শুরু করে এলাকায় এলাকায় প্রচার চালানো হয়। অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির নেতৃত্বে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও এলাকায় যে শত শত আন্দোলনের কমিটি গঠিত হয়েছে এবং যে কমিটিগুলিতে ইতিমধ্যেই হাজার হাজার মানুষ সামিল হয়েছেন তাঁরাই লাগাতার জেলা ও লোকাল স্তরে সংগঠিত হয়ে অসংখ্য ধরনা, মিছিল, অবস্থান ও ডেপুটেশনের কর্মসূচি পালন করেন। এই কর্মসূচিগুলিতে রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের মানুষ সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের শিক্ষা স্বার্থবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে ধিক্কার জানান। এরই ধারাবাহিকতায় ৩১ মার্চের কর্মসূচিতে দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলা থেকে শত শত মানুষ যোগ দেন।

সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে সভায় বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন উপাচার্য ও কমিটির সভাপতি চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, বিশিষ্ট ভূ-বিজ্ঞানী ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন অধ্যক্ষ মৈত্রেয়ী বর্ধন রায়, অধ্যক্ষ শিবশঙ্কর পাল, অধ্যক্ষ বি আর প্রধান, কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর। সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অনীশ রায় অসুস্থ থাকার কারণে লিখিত বার্তা পাঠান। সকলেই জনবিরোধী এই শিক্ষানীতি চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন এবং এই শিক্ষানীতি সম্পর্কে রাজ্য সরকারের অভিমত স্পষ্ট করে জনসমক্ষে আনার দাবি জানান। পার্থ চ্যাটার্জী শিক্ষামন্ত্রী থাকার সময় যে বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি হয়েছিল শিক্ষানীতি সম্পর্কে সেই কমিটির অভিমত প্রকাশ করার দাবি করেন রাজ্য সম্পাদক তরুণকান্তি নস্কর।

সভা শেষে সুসজ্জিত পদযাত্রা এগিয়ে চলে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ের দিকে। মিছিল শেষে বিশ্বজিৎ মিত্রের নেতৃত্বে মাহফুজুল আলম, কানাইলাল দাস ও আনন্দ হাণ্ডা এই চার সদস্যের এক প্রতিনিধিদল রাজভবনে গিয়ে স্মারকলিপি দেন। অবিলম্বে জাতীয় শিক্ষানীতি ও পিপিপি মডেল বাতিল করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করার ঘোষণা করেন নেতৃবৃন্দ। ওই দিন কোচবিহার, মালদহ, উত্তর দিনাজপুর, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও একই সাথে কর্মসূচি রূপায়িত হয়েছে।

## দিল্লিতে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত সম্মেলনে এআইডিওয়াইও

দিল্লির শাহ অডিটোরিয়ামে ২৩-২৪ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 'দেশ কি বাত' সংস্থা আয়োজিত জাতীয় কর্মসংস্থান সম্মেলন। এই সংস্থার তৈরি জাতীয় কর্মসংস্থান নীতির খসড়া নিয়ে আলোচনায় আমন্ত্রিত হয়েছিল এআইডিওয়াইও। সংগঠনের পক্ষ থেকে সেখানে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড অমরজিত কুমার।

সম্মেলনে কমরেড অমরজিত বলেন, বিশ্ব জুড়ে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে কর্মহীনতার সমস্যা ক্রমেই বাড়ছে। ইতিহাস দেখিয়েছে, কেবল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি পরিকল্পিত অর্থনীতি অনুসরণ করে এই সমস্যা সম্পূর্ণ ভাবে সমাধান করতে পেরেছিল। দেশের বেকার সমস্যার তীব্রতা কমাতে বেশ কয়েকটি সুপারিশ পেশ করেন তিনি। তিনি বলেন, কর্মসংস্থানের বৃহত্তম ক্ষেত্র হিসাবে কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়ন ঘটানো, ফসলের ন্যূনতম দাম নিশ্চিত করা, সার-বীজ-কীটনাশকে ভরতুকি দিতে হবে। চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক বেকারকে ভাতা দিতে হবে এবং তার পরিমাণ সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরির অন্তত ৫০ শতাংশ হতে হবে। একশো দিনের কাজে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করে কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

# সরকারি নিস্পৃহতাই পণপ্রথা টিকে থাকার মূলে

নিরুপমাকে মনে পড়ে? রবীন্দ্রনাথের 'দেনা-পাওনা' গল্পের নিরুপমা, যার বাবা রায়বাহাদুরের ঘরে মেয়েকে পাত্রস্থ করেছিলেন, কিন্তু পণের দশ হাজার টাকার সবটা জোগাড় করে উঠতে পারেননি। প্রায় ভাঙতে ভাঙতেও সে বিয়েটা কোনওমতে হয়ে যায়, কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে প্রতিনিয়ত অপমান-অসম্মান সহ্য করে নিরুপমাকে পড়ে থাকতে হয় একটা মূল্যহীন বস্তুর মতো। আর একটি দিনও নিজের বাড়ি যাওয়ার অনুমতি পায়নি সে। দুঃখে যন্ত্রণায় নিজের শরীরের প্রতি অবহেলা করে একরকম আত্মহত্যার পথই বেছে নিয়েছিল নিরুপমা, এ দেশের হাজার হাজার মেয়ের মতোই। তার মৃত্যুর পরেই আর একটি সম্বন্ধস্থির করে প্রবাসী ছেলেকে চিঠি লেখেন বাবা-মা। গল্পের শেষ লাইনটা ছিল চাবুকের মতো, 'এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়'।

রবীন্দ্রনাথ 'দেনা-পাওনা' লিখেছিলেন ১৮৯১ সালে। এটা ২০২২ সাল। দিন দশেক আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। বিয়ে করতে আসা বর বলছেন, 'পণ কেন নেব না? এতে ভুল কোথায়?' হবু স্ত্রী'র পাশে বসে তিনি জানাচ্ছেন, চাহিদামতো সব টাকা পেলে তবেই তিনি বিয়ে করবেন, নয়তো ফিরে যাবেন। বধূবেশে সজ্জিত মেয়েটি খানিকটা অনুরোধের সুরে বলছে, তার বাবা বকেয়া টাকা পরে দিয়ে দেবেন। কিন্তু পাত্রের হাবভাবে মনে হচ্ছে না এ কথায় চিঁড়ে ভিজবে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ঠিক পরের দিন একটি বহুল প্রচারিত বাংলা দৈনিকের ভেতরের পাতার এক কোনায় এই খবরটি বেরিয়েছে। তার ঠিক নিচেই আছে আরেকটি খবর। নারী দিবসে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের মহিলাদের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী কি এই ভিডিওটি দেখেছেন? সম্ভবত না। চব্বিশ ঘণ্টা দেশের মানুষের সেবায় ব্যস্ত থাকতে হয় যাঁদের, ধরে নেওয়া যায় এমন একটি সামান্য ভিডিও তাঁদের নজরে আসবে না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি নিশ্চয়ই জানেন, স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও পণপ্রথা আজও ভারতবর্ষের একটি ভয়ঙ্কর সামাজিক ব্যাধি। পণ দিতে গিয়ে বহু সংসার আজও আর্থিক ভাবে পঙ্গু হয়ে যায়, প্রতিশ্রুতি মতো পণ মেলেনি বলে পাত্র বিয়ের আসর থেকে উঠে যায়। পণ আদায়ের জন্য শ্বশুরবাড়িতে সদ্য বিবাহিত মেয়ের ওপর চলে নানারকম অত্যাচার। সংবাদপত্রে চোখ রাখলে বোঝা যায়, কটু কথা, অপমান, মানসিক নির্যাতন থেকে শুরু করে শারীরিক নিগ্রহ, বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া, এমনকি বধূহত্যার মতো মর্মান্তিক ঘটনা প্রায়শই ঘটে, যার মূলে আছে এই অন্যায় প্রথা। অথচ সব জেনেও কোনও দলের নেতা-মন্ত্রীকে এর বিরুদ্ধেকার্যকরী পদক্ষেপ নিতে দেখা যায় না।

দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় বসে স্লোগান তুলেছিলেন, 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও'। যদিও সম্প্রতি সংবাদে প্রকাশ পেয়েছে এই প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ বিপুল পরিমাণ অর্থের সিংহভাগই খরচ হয়েছে বিজ্ঞাপনী প্রচারে। পণপ্রথার অত্যাচার থেকে বেটিদের বাঁচানো এই প্রকল্পের আওতায় ছিল কিনা, তা সরকারি কর্তারাই ভালো বলতে পারবেন। তবে চারপাশে চোখ মেলে তাকালে বোঝা যায়, কেন্দ্রের 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' হোক বা রাজ্যের কন্যাশ্রী-রূপশ্রী মেয়েদের জীবনের প্রকৃত সমস্যায় আঁচড় কাটতে পারেনি। সত্যিই কী নেতা-মন্ত্রীরা পণপ্রথার অবসান চান? ভিডিওটিতে ওই যুবক বলেছেন, কে বলল পণপ্রথা নেই? সবাই জানে পণপ্রথা আছে। কথাটা মিথ্যে নয়। পণপ্রথা বিরোধী আইন থাকা সত্ত্বেও পণপ্রথা যে আছে এবং রমরমিয়ে চলছে এ তো সবাই জানে। সরকার জানে, পুলিশ জানে, মন্ত্রী-আমলা-পঞ্চায়েত সদস্য সকলেই জানেন। সবাই জানা সত্ত্বেও এরকম ঘৃণ্য প্রথা দিনের পর দিন চলছে কী করে?

কেন্দ্র-রাজ্য সব সরকারেরই নারীকল্যাণ, সমাজকল্যাণ দপ্তর রয়েছে, তার নানা স্তরের মন্ত্রীরা রয়েছেন, ডজন ডজন আমলা-অফিসার-কর্মচারী রয়েছেন, তাঁদের পিছনে শত শত কোটি টাকা প্রতি বাজেটে বরাদ্দ হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা কী? কেন পণপ্রথা বিরোধী আইন কার্যকর করা হয় না? কেন নিষ্ঠুর এই প্রথার বিরুদ্ধে লাগাতার প্রচার চালানো হয় না? কেন এটিকে একটি সামাজিক আন্দোলনের রূপ দেওয়া হয় না?

নবজাগরণের মনীষীরা ও স্বাধীনতা সংগ্রামীরা চেয়েছিলেন নারীরা স্বাধীন দেশে মর্যাদাময় জীবন পাবে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বেগম রোকেয়া, জ্যোতিবারাও ফুলের মতো মানুষরা আন্দোলন গড়ে তুলে নারীদের জন্য বেশ কিছু দাবি আদায় করেছিলেন। তাঁদের অপূরিত স্বপ্ন পূরণ করার দায়িত্ব তো ছিল স্বাধীন দেশের সরকারের। ৭৫ বছরেও তা পূরণ হল না কেন? এক নারী দীর্ঘ সময় ধরে দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, রাজ্যে রাজ্যে কত মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হলেন, কিন্তু নারীত্বের তথা মানবতার চরম অপমান পণপ্রথা বন্ধ হল না কেন? আজও তো কত মহিলা বিধায়ক, সাংসদ, মন্ত্রী হয়ে রয়েছেন, তাঁরা এই প্রথা অবিলম্বে বন্ধের দাবিতে বিধানসভায়, লোকসভায় ঝড় তোলেন না কেন?

সরকারে যারাই থাকুক, নারীদের জীবনের অবহেলা-অত্যাচারের ছবিটা কমবেশি একই থেকে যায়। ১৯৬১-তে পণপ্রথা বিরোধী আইন হয়েছে। ২০২০-তে পণের নথিভুক্ত অভিযোগ ১০৩৬৬টি এবং এই কারণে মৃত্যুর সংখ্যা ৬৯৬৬। 'লিঙ্গ বৈষম্যের' তালিকায় ১৫৬টি দেশের মধ্যে ভারত ১৪০তম। অবশ্য হবে নাই বা কেন ? দেশের যারা পরিচালক, লোকসভার সেই ৫৪৩ জন সদস্যের মধ্যে ২৩৩ জনের বিরুদ্ধে নানা অপরাধমূলক কাজের অভিযোগ আছে এবং অনেকগুলোই ধর্ষণ বা নারী নির্যাতনের অভিযোগ। প্রধানমন্ত্রী যতই 'বেটি বাঁচাও' স্লোগান দিন, তাঁর দলের নেতাকর্মীরাই তো কাঠুয়ায় ধর্ষকদের সমর্থনে মিছিল করেছে, উন্নাও, হাথরসে নির্যাতিতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, বারবার নির্যাতিতার পরিবারের ওপর আক্রমণ করেছে, প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করেছে। বিজেপি-আরএসএস এর বিভিন্ন নেতা-মন্ত্রীরা নারীদের সম্পর্কে যা মন্তব্য করেছেন বা করছেন, তাতেই বোঝা যায় তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানসিকতা অন্ধকারাচ্ছন্ন সামন্ততান্ত্রিক যুগেরই। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিও মুখে যতই নারী প্রগতির কথা বলুক, বাস্তবে নারীদের প্রতি সমাজ মানসিকতা পরিবর্তনের জন্য, মর্যাদা ও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল তার কিছুই করেনি। তাই আজও সমাজে পণের দাবিতে বধূ হত্যা, কন্যাভ্রূণ হত্যা, বাল্যবিবাহ, নারী-শিশু পাচার, কর্মস্থলে যৌন হয়রানি, ধর্ষণ, গণধর্ষণ, হত্যার মতো জঘন্য অপরাধমূলক ঘটনার প্রবাহ বন্ধ হয়নি, বরং বেড়ে চলেছে।

আসলে সমাজ মানসিকতায় গেড়ে বসা পুরুষতন্ত্রকে সমূলে উচ্ছেদ করতে হলে পুঁজিবাদী সমাজকাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রেখে তা কখনই সম্ভব নয়। একটি সামাজিক কুপ্রথার মূলে গিয়ে জোরালো আন্দোলন শুরু করতে গেলে তা আরও অনেকগুলো অন্যায়ের গোড়া ধরে নাড়া দেবে এবং শেষপর্যন্ত এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার বিপক্ষে জনমত তৈরি করবে। যেমন, পণপ্রথা নির্মূল করতে যথাযথ আইনি পদক্ষেপ এবং সামাজিক আন্দোলন যদি করতে হয়, তাহলে একদিকে বহু তথাকথিত প্রভাবশালী লোকজনের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে, অন্যদিকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যথার্থ আধুনিক গণতান্ত্রিক চেতনা গড়ে তুলতে হবে। মানুষ তখন শুধু পণপ্রথাই নয়, নারীদেহের পণ্যায়ন, নারীর সার্বিক অবদমনের মতো জিনিসগুলোর বিপক্ষে সরব হবে, এর আসল কারণ খুঁজতে চাইবে। মানুষকে মদ-জুয়া-ফুর্তিতে মাতিয়ে রেখে তার ওপর লাগামছাড়া শোষণ চালিয়ে যাওয়া তখন সহজ হবে না। তাই পুঁজিপতিদের আশীর্বাদ নিয়ে ক্ষমতায় বসা কোনও দলই যথার্থ নারীমুক্তি চাইতে বা দিতে পারে না। আবার এই ব্যবস্থার মধ্যেও যদি রুখে দাঁড়াতে হয়, সেখানে মেয়েদের শিক্ষা এবং আত্মমর্যাদার প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের নিরুপমা তার বাবাকে বলেছিল, 'টাকা যদি দাও তবেই অপমান। তোমার মেয়ের কি কোনও মর্যাদা নেই। আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম। না বাবা, এ টাকা দিয়ে তুমি আমার অপমান কোরো না'। এই মর্যাদাবোধ সঞ্চারিত করতেই 'স্বদেশ ও সাহিত্য' প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন, "আসল প্রতিকার মেয়ের বাপের হাতে, যে টাকা দেবে তার হাতে। অধিকাংশ কন্যাদায়গ্রস্তই আমার কথা বোঝে না, কিন্তু কেউ কেউ বোঝেন। তারা মুখখানি মলিন করে বলেন — সে কি করে হবে মশাই, সমাজ রয়েছে যে! সমস্ত মেয়ের বাপ যদি এ কথা বলেন তো আমিও বলতে পারি, 'কিন্তু একা তো পারিনে' কথাটা তার বিচক্ষণের মতো শুনতে হয় বটে, কিন্তু আসল গলদও এইখানে। কারণ, পৃথিবীতে কোনও সংস্কারই কখনও দল বেঁধে হয় না। একাকীই দাঁড়াতে হয়। এর দুঃখ আছে। কিন্তু এই স্বেচ্ছাকৃত একাকীত্বের দুঃখ একদিন সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বহু-র কল্যাণকর হয়। মেয়েকে যে মানুষ বলে নেয়, কেবল মেয়ে বলে, দায় বলে, ভার বলে নেয় না, সে-ই কেবল এর দুঃখ বইতে পারে, অপরে পারে না"। যুগ পাল্টে ছে নিশ্চয়ই, মেয়েরাও অনেকাংশে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাধীন সচেতন হয়েছেন, পণ নেওয়া বা দেওয়া অনুচিত এটাও তারা বোঝেন, কিন্তু সত্যের জন্য একা দাঁড়ানোর এই যে শিক্ষা বা জোর, এর থেকে আজও আমরা অনেক দূরে। যে স্বপ্ন নিয়ে নবজাগরণের যুগে নারীমুক্তির আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তার সম্যক রূপ সম্পর্কে আজও বেশিরভাগ মানুষ সচেতন নন।

দীর্ঘদিনের পিতৃতান্ত্রিক মনন, মেনে চলা ও মানিয়েচলার অভ্যাস থেকে আজও নারীরা বেরিয়ে আসতে পারছে না। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ মেয়েরা পেয়েছে অনেক দিন, বাইরের জগতের কাজও করছে অনেকেই। কিন্তু অভাব থেকে যাচ্ছে প্রকৃত শিক্ষার যা মর্যাদাবোধ জাগায়, দায়িত্ব কর্তব্যবোধ শেখায়, যথার্থ অর্থে মানুষ হতে শেখায়। গতানুগতিকতা থেকে বেরিয়ে মাথা উঁচু করে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার বলিষ্ঠতা দেখাতে পারছেন কজন মহিলা? সামাজিক এই অবস্থার পরিবর্তনে মহিলা সংগঠনগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু বেশির ভাগ মহিলা সংগঠনই নিয়মমাফিক কিছু কর্মসূচি পালন করেই দায়িত্ব শেষ করছে। অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন যথার্থ চেতনা ও আত্মমর্যাদার ভিত্তিতে নারীদের সংগঠিত করে সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করে চলেছে সারা দেশ জুড়ে। উপযুক্ত শক্তি অর্জন করতে, তার সাথে সোচ্চার হয়ে দাঁড়াতে হবে সমস্ত শিক্ষক-অধ্যাপক-কর্মচারী সংগঠনগুলিকেও। ভুললে চলবে না, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে চালাতে হবে লড়াই। সমাজ অগ্রগতির পরিপূরক এই নারীমুক্তি আন্দোলনই পণপ্রথার মতো কুপ্রথার অবসান ঘটাতে পারে, দিতে পারে আলোর ঠিকানা।

## অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বিক্ষোভ অবস্থান

ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার ভিত গড়েন যে প্রাথমিক শিক্ষকরা, অবসর নেওয়ার পর তাঁদের চরম বঞ্চনার শিকার হতে হচ্ছে। পেনশন পেতে কালঘাম ছুটে যাচ্ছে। ডিএ কিংবা ঘরভাড়া ভাতা নেই। চিকিৎসা ভাতাও যৎসামান্য। এর ওপর ব্যাঙ্কে গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়ানো সহ লাইফ সার্টিফিকেট জমা দিতে চূড়ান্ত হয়রানির কারণে প্রবীণ শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিপর্যস্ত। এর বিরুদ্ধে অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির আহ্বানে ৩০ মার্চ কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ অবস্থানে সামিল হন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা। অবস্থানে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কার্তিক সাহা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। অবস্থানে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ বাতিলের দাবি জানানো হয়।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24



# বগটুই গণহত্যা ঃ প্রতিবাদ রাজ্য জুড়ে

২১ মার্চ বীরভূমের রামপুরহাট ব্লকে বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ও উপপ্রধানের হত্যার পরেই বগটুই গ্রামে যে নৃশংস গণহত্যা হয়েছে তাতে মানুষ শিউরে উঠেছে। ২২ মার্চ কলকাতা ও শিলিগুড়িতে এস ইউ সি আই (সি)-র বিক্ষোভ মিছিলের শুরুতেই এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে অবিলম্বে দোষীদের শাস্তি ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের দাবি জানানো হয়। ২৩ মার্চ দলের কর্মীরা এই ঘটনার প্রতিবাদে বিধানসভার গেটে বিক্ষোভ দেখালে পুলিশ ৩৯ জনকে গ্রেপ্তার করে। বগটুইয়ের ঘটনা এবং গণআন্দোলনের কর্মীদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে দলের পক্ষ থেকে ২৪ মার্চ সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবস পালনের আহ্বান জানানো হয়। সমস্ত জেলাতেই প্রতিবাদ দিবসে বিক্ষোভ মিছিল, সভা হয়। রাজ্যের সর্বত্র থানার ওসিদের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে দাবিপত্র পাঠিয়ে বগটুই গণহত্যার নিরপেক্ষ তদন্ত, রাজ্যে ঘটে চলা একের পর এক রাজনৈতিক হত্যা বন্ধ, পুলিশের দলদাস সুলভ আচরণের পরিবর্তে নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ, দল বিচার না করে সমস্ত দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, সমস্ত নাগরিকের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়।

বীরভূমের সিউড়িতে জেলাশাসক দপ্তরের সামনে ৩১ মার্চ দলের পক্ষ থেকে অবস্থান বিক্ষোভ হয় (ছবি)। জেলা সম্পাদক মদন ঘটকের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেন। মালদহ শহরে দলের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ ও পথসভা হয়। হরিশ্চন্দ্রপুর শহিদ মোড়ে বিক্ষোভ দেখানোর পর মিছিল করে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দলের জেলা সম্পাদক কমরেড গৌতম সরকার সহ অন্যান্য নেতারা বক্তব্য রাখেন। পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়িতে রবীন্দ্র মূর্তির পাশ থেকে মিছিল শুরু হয়ে বাজার এলাকা পরিক্রমা করে। থানার সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয় ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

# মোটরভ্যান চালকদের পরিবহণ ও শ্রমদপ্তর অভিযান

রাজ্যে ৩ লক্ষের বেশি গ্রাম-মফঃস্বলের বেকার যুবক মোটরভ্যান চালিয়ে কোনও ক্রমে হলেও সংসার প্রতিপালন করেন। কৃষক, সবজি বিক্রেতা, ছোট দোকানদাররা কম খরচে এই গাড়ি পণ্য পরিবহণের কাজে ব্যবহার করে। পুলিশ-প্রশাসনও তাদের কাজে মোটরভ্যান ব্যবহার করে। তা সত্ত্বেও মোটরভ্যান চালকদের সরকারি লাইসেন্স দেওয়া হয়নি। সরকার ২০১৩-তে একবার, পরে '১৬ তে লাইসেন্স দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেও তা কার্যকর করেনি।

এই অবস্থায় চালকদের স্থায়ী সরকারি লাইসেন্স, শ্রমিকের স্বীকৃতি দিয়ে পরিচয়পত্র ও সামাজিক সুরক্ষা, যাঁরা এখনও অস্থায়ী লাইসেন্স (টিন) পাননি তাঁদের দ্রুত দেওয়ার ব্যবস্থা, দুর্ঘটনাজনিত বিমা, করমুক্ত ডিজেল এবং পিএফ-পেনশন চালুর দাবিতে ২৪ মার্চ রাজ্য পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরে বিক্ষোভ-অভিযান সংগঠিত করে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়ন।

প্রায় ১০ হাজার মোটরভ্যান শ্রমিকের বিশাল মিছিল সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ের বিক্ষোভ সমাবেশে পৌঁছায়। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অশোক দাসের সভাপতিত্বে সমাবেশের কাজ শুরু হয়। নেতৃবৃন্দ ও চালকরা বক্তব্য রাখেন। রাজ্য সম্পাদক দীপক চৌধুরীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল পরিবহণমন্ত্রী ও শ্রমমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেন।

# মিড-ডে মিল কর্মীদের বিশাল বিক্ষোভ মিছিল

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সীমাহীন বঞ্চনার বিরুদ্ধে ২৬ মার্চ কলকাতায় বিক্ষোভ দেখালেন হাজার হাজার মিড-ডে মিল কর্মী।

সরকারি মিড-ডে মিল প্রকল্পে কাজ করেন পশ্চিমবঙ্গের প্রায় আড়াই লক্ষ কর্মী। প্রতিদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মুখে রান্না করা খাবার তুলে দেন তাঁরা। অথচ এই চরম মূল্যবৃদ্ধির মধ্যে আজও তাঁদের বেতন মাসিক মাত্র ১৫০০ টাকা। এ টাকাও মেলে বছরে মাত্র ১০ মাস। ২০১৩ সালের পর থেকে এই কর্মীদের বেতন এক পয়সাও বাড়ায়নি সরকার, উপরন্তু এ বছরের কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রকল্পের বরাদ্দ টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এর বিরুদ্ধে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের ডাকে এ দিন বিভিন্ন জেলা থেকে আসা হাজার হাজার মিড-ডে মিল কর্মী সমবেত হয়েছিলেন সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে। সেখান থেকে দাবি সংবলিত ব্যানার-প্ল্যাকার্ডে সুসজ্জিত একটি মিছিল পৌঁছায় ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিংয়ে। সেখানে বরাদ্দ কমানোর প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়। রানি রাসমণি অ্যাভেনিউয়ের বিক্ষোভ সমাবেশে মিছিল পৌঁছলে সেখানে সভা শুরু হয়।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি সনাতন দাস। প্রধান বক্তা ছিলেন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ সভাপতি নিখিল বেরা, রাজ্য সম্পাদিকা সুনন্দা পণ্ডা সহ বিভিন্ন জেলা ও অন্যান্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। বক্তারা সকলেই এই আন্দোলন আরও শক্তিশালী করার ওপর জোর দেন ও জানান, অবিলম্বে দাবি মানা না হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। একটি প্রতিনিধিদল রাজ্যের মিড-ডে মিল প্রজেক্ট ডিরেক্টরের কাছে স্মারকলিপি দেয়।

# বগটুই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা ও দোষীদের শাস্তির দাবি

## শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চের

বগটুই সহ রাজ্যে একের পর এক হত্যা, আইন শৃঙ্খলার অধঃপতন, পুলিশ প্রশাসনকে দলদাসে পরিণত করা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার হরণ করার বিরুদ্ধে ১ এপ্রিল বিকেলে কলকাতার প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় মেন গেটে প্রতিবাদ অবস্থান করে শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চ। অবস্থানে শাসক দলের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করা হয়। বক্তারা বলেন, পুলিশ প্রশাসনকে সম্পূর্ণ কুক্ষিগত করে, দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা এবং নিজেদের লোভ লালসা ও অবাধ লুটতরাজের রাজত্ব কায়েম হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রীর প্রশ্রয়েই। এ-সবের জন্য বাংলার মানুষ পরিবর্তন চাননি।

বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ও মঞ্চের সভাপতি বিভাস চক্রবর্তী, প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল বিমল চ্যাটার্জী, শিক্ষাবিদ মীরাতুন নাহার, মানবাধিকার আন্দোলনের অন্যতম নেতা সুজাত ভদ্র, বিশিষ্ট আইনজীবী পার্থসারথী সেনগুপ্ত, অধ্যাপক অশোকেন্দু সেনগুপ্ত, অধ্যাপক তরুণ দাস, বিশিষ্ট সাংবাদিক দিলীপ চক্রবর্তী, চিকিৎসক দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী, অধ্যাপক সুদীপ্ত দাশগুপ্ত, সাহিত্যিক ও নাট্যকর্মী সর্বাণী চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী পল্লব কীর্তনীয়া প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন উদয় বন্দোপাধ্যায়, পল্লব কীর্তনীয়া, আশিস বসু ও অন্যরা। কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি করেন রূপশ্রী কাহালি, সাইফুল ইসলাম প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ গৌতম সাহা, শিক্ষক অজিত হোড়, ডঃ মৃদুল দাস, ডাঃ তরুণ মণ্ডল, অধ্যাপক মানস জানা প্রমুখ।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com